HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৯ • সংখ্যা ১ • মার্চ ২০১১

আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

অন্যান্য পাতায়

পৃষ্ঠা ৯

বাংলাদেশে কমপুষ্টি: একটি পর্যালোচনা

পৃষ্ঠা ১৭

এক স্বাস্থ্য (ওয়ান হেলথ) ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন

পৃষ্ঠা ২১

সার্ভিলেন্স আপডেট

একটি স্কুল খাদ্য কর্মসূচিতে গণসামাজিক-অসুস্থতার (ম্যাস সোশিওজেনিক ইলনেস) প্রাদুর্ভাব

একটি স্কুল খাদ্য কর্মসূচি কর্তৃক বিতরণকৃত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্কুট খেয়ে ২০১০ সালের অক্টোবরে গাইবান্ধা জেলার দুটি উপজেলার চারটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এটি খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত অসুস্থতা ছিলো কি না তা আইইডিসিআর এবং আইসিডিডিআর,বি-র একটি যৌথ অনুসন্ধানী দল পরীক্ষা করে দেখে। দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ার পর আবার দ্রুত সেরে ওঠা; অসঙ্গত/অসামঞ্জস্য স্বাস্থ্যগত, ল্যাবরেটরি এবং পরিবেশ-সংক্রান্ত ফলাফল; ঘটনাবলীর প্রবাহকাল এবং বাংলাদেশে এ-সংক্রান্ত প্রাদুর্ভাবের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে, এটি ছিলো গণসামাজিক অসুস্থতা, খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত নয়। অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত প্রাদুর্ভাবের ফলাফল শিক্ষার্থী এবং এলাকার লোকজনকে জানানো এবং বিস্কুটের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাদেরকে পুনরায় আশ্বাস প্রদানের জন্য নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত প্রচারাভিযানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ভয় এবং উদ্বিগ্নতা দূর করে ভবিষ্যতে এ-ধরনের প্রাদুর্ভাব কমিয়ে আনা যেতে পারে। স্কুলভিত্তিক পুষ্টি সরবরাহ কর্মসূচি যেহেতু বাংলাদেশের অপুষ্টি কমিয়ে আনতে সহায়তাকারী একটি কর্মসূচি, সেহেতু স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকা উচিত।

এপিডেমিক হিস্টেরিয়া বা সাইকোজেনিক অসুস্থতা হিসেবে পরিচিত গণসামাজিক-অসুস্থতাজনিত প্রাদুর্ভাব ইতোপূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংঘটিত হয়েছে (১-৩)। দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ার পর রোগের লক্ষণ এবং চিহ্নসমূহ শরীরের অভ্যন্তরীণ বিকারজনিত

icddr,b

KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

কারণ ছাড়াই একই এলাকায় বসবাসকারী রোগীর সমবয়সীদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এ-ধরনের প্রাদুর্ভাব শুরুর ইংগিত বহন করে (৪,৫)। এ-ধরনের অসুস্থতার আরো বৈশিষ্ট্য হলো - দ্রুত সেরে ওঠা, মেয়েদের মধ্যে এর প্রবণতা বেশি দেখা দেওয়া এবং অন্য কারো অসুস্থতা চোখে দেখে বা শুনে অসুস্থ হয়ে পড়া (৬,৭)।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সরবরাহকৃত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্কুটের সন্দেহজনক বিষাক্ততায় সংঘটিত একটি প্রাদুর্ভাবের খবর ২৭ এবং ৩০ অক্টোবর কতিপয় জাতীয় দৈনিকে প্রচারিত হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় একটি 'স্কুল খাদ্য কর্মসূচি'-র আওতায় বাংলাদেশের নির্দিষ্ট দরিদ্র প্রবণ এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীন এলাকার সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের ৪০০,০০০ শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন টিফিন হিসেবে আটটি করে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হয়। অলাভজনক বেসরকারি সংস্থার সেবা প্রদানকারীগণ এবং (মাতাপিতা, অভিভাবক, শিক্ষক এবং স্কুল কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত) স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এই বিস্কুট বিতরণ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং গুদামজাতকরণ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করেন (৮,৯)।

খাদ্যে বিষ সন্দেহে সংঘটিত এই প্রাদুর্ভাবে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ এবং শাঘাটা উপজেলার কতিপয় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত উপজেলাগুলোর উপজেলা স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তারা বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখেন। পরে গাইবান্ধা জেলার সিভিল সার্জন ঘটনাটিকে একটি আকস্মিক আতংক হিসেবে উল্লেখ করেন এবং সেখানে খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত কোনো ধরনের প্রাদুর্ভাব ছিলো না বলে বিবরণ প্রদান করেন।

ঘটনার পর বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির 'স্কুল খাদ্য কর্মসূচি' স্থগিত করা হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির অনুরোধে তখন সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে (আইসিডিডিআর,বি)-র একটি যৌথ প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধানী দল ঘটনা তদন্তের জন্য ৬ নভেম্বর ২০১০ তারিখে আক্রান্ত জেলায় যায়।

অনুসন্ধানী দলটি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে। এরপর তাঁরা প্রাদুর্ভাবের ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং এর সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচিত আক্রান্ত শিক্ষার্থী, তাদের মাতাপিতা, স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ, প্রধান শিক্ষক, স্কুল শিক্ষক এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার (কাঠামোবিহীন) গ্রহণ করেন। অনুসন্ধানী দলের সদস্যরা শাঘাটায় আক্রান্ত তিনটি স্কুল এবং গোবিন্দগঞ্জে আক্রান্ত একটি স্কুল পরিদর্শন করেন, এবং ব্যক্তি, স্থান ও সময়ের সাথে প্রাদুর্ভাবের সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য একটি বর্ণনামূলক গবেষণা পরিচালনা করেন।

প্রাথমিক অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী বিস্কুট খাওয়ার পর বমি বমি ভাব, খাবারে তিক্ত অনুভূতি, পেটে ব্যাথা এবং বমি করার কথা জানায়। তাদের মধ্যে ১০৯ জন চিকিৎসাসেবা নেওয়ার জন্য যায় এবং তাদেরকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

যেকোনো শিক্ষার্থী উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্কুট খেয়ে বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, ডায়রিয়া, বুক জ্বলা, খাবারে তিক্ততা, মাথাব্যাথা, ঘাড়ব্যাথা, এবং/অথবা বুক ব্যাথাসহ যেকোনো দুটো লক্ষণের কথা জানিয়েছে, অনুসন্ধানকারীগণ তাকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্কুটের সন্দেজনক বিষাক্ততায় আক্রান্ত একজন

রোগী হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এই সংজ্ঞা ব্যবহার করে তাঁরা সন্দেহজনক রোগীদের একটি লাইন তালিকা তৈরি করেন। তারপর তাঁরা রোগসম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য পূর্বপরীক্ষিত কাঠামোগত একটি প্রশ্নমালার সাহায্যে সন্দেহজনক রোগীদের ওপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন। বিশেষ করে তাঁরা সন্দেহজনক রোগীদের উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্কুট খাওয়া, তাদের তখনকার খাবার পানির উৎস, তখন থেকে বিগত ২৪ ঘণ্টায় তাদের খাওয়া খাবার, ওষুধ, তাদের রোগ, এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। রোগীর এই সংজ্ঞা অনুযায়ী তাঁরা আক্রান্ত চারটি স্কুল থেকে মোট ৪৪ জন সন্দেহজনক রোগী নির্বাচন করে তা রেকর্ড করেন (সারণি ১)। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাসেবা নিতে যাওয়া ১০৯ জন শিশুর মধ্যে ৬৫ জন গিয়েছিলো অসুস্থ হয়ে পড়ার ভয়ে এবং তারা শারীরিক কোনো লক্ষণের কথা জানায় নি। অনুসন্ধানকারীগণ তাদেরকে লাইন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি।

সারণি ১: ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে গাইবান্ধা জেলার চারটি স্কুলে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্কুট খেয়ে খাদ্যে বিষক্রিয়ার সন্দেহে আক্রান্ত রোগীদের বিন্যাস

স্কুল ও উপজেলার নাম	আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা = ৪৪ (%)	বিস্কুট খাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে সন্দেহজনক রোগীর অনুপাত (%)
শাহাবাজেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক স্কুল, শাঘাটা	৭ (১৬)	৭/১৬১ (৪)
বারোকোনা সরকারি প্রাথমিক স্কুল, শাঘাটা	১৫ (৩৪)	১৫/২৫২ (৬)
শুজালপুর সরকারি প্রাথমিক স্কুল, শাঘাটা	৩ (৭)	৩/২৫১ (১)
কালিতলা দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক স্কুল, গোবিন্দগঞ্জ	১৯ (৪৩)	১৯/২৫৬ (৭)

চুয়াল্লিশজন সন্দেহজনক রোগী থেকে অনুসন্ধানকারীগণ ৩০ জনের মধ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করেন যারা অনুসন্ধান চলাকালীন সময়ে তাদের নিজ নিজ স্কুলে উপস্থিত ছিলো। তাদের গড় বয়স ছিলো ৯.৩ বছর (রেঞ্জ: ৭-১২) এবং ৭০% (২১/৩০) ছিলো মেয়ে। প্রধান উপসর্গসমূহের মধ্যে ছিলো পেটে ব্যাথা, গলায় জ্বালাপোড়া করা এবং খাবারে তিক্ততা অনুভব করা, মাথাব্যাথা, বমি বমি ভাব, সার্বজনীন দুর্বলতা, বমি করা এবং ডায়রিয়া (সারণি ২)। তারা গড়ে ৬.২টি করে বিস্কুট খেয়েছিলো (রেঞ্জ: ১-৮)। তাদের ওইদিনের খাবার পানির উৎস সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য বের করা সম্ভব হয় নি। লক্ষণগুলো প্রকাশের পূর্বের সাতদিনের মধ্যে তাদের কেউ কৃমিনাশক ট্যাবলেট গ্রহণ করে নি। প্রায় ২০% অভিযোগ করে যে, সেদিনের বিস্কুটগুলো ছিলো হয় তিতা নয়তো খারাপ গন্ধযুক্ত অথবা সেগুলোর রং ছিলো সাধারণ বিস্কুটের তুলনায় বেশি ঘন (ঘন বাদামী/কালো)। দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রায় ৯০% (১৭/১৯) আক্রান্ত শিক্ষার্থী জানায় যে, ওইদিন সকালে তারা বিস্কুটের প্যাকেটে একধরনের কালো কালির ল্যাবেলিং দেখেছে যা তাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। ইতোপূর্বে তারা সব সময় নীল কালির লেখা দেখেছে। পরে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি থেকে জানা যায় যে, একটি কারখানা তাদের নীল কালি শেষ হয়ে যাওয়ায় কিছু প্যাকেটে কালো কালি ব্যবহার করেছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিকে না জানিয়ে কালির সামান্য এই পরিবর্তন এনেছিলো কেননা কালির রং বিস্কুটের গুণগত মানের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিও কালি ব্যবহারের

ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম ইতোপূর্বে বেধে দেয় নি।

সারণি ২: ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে গাইবান্ধা জেলার চারটি স্কুলের আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য ও বর্ণিত রোগের লক্ষণ

বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ	সংখ্যা=৩০ (%)
লিংগ	
পুরুষ	৯ (৩০)
মহিলা	২১ (৭০)
শিক্ষার্থী	
প্রথম শ্রেণী	৭ (২৩)
দ্বিতীয় শ্রেণী	১১ (৩৮)
তৃতীয় শ্রেণী	৪ (১৩)
চতুর্থ শ্রেণী	৭ (২৩)
পঞ্চম শ্রেণী	১ (৩)
লক্ষণ	
পেটে ব্যাথা	২৮ (৯৩)
গলায় জ্বালাপোড়া করা	২৭ (৯০)
গলার কাছে তিতা স্বাদ	১৭ (৫৭)
মাথাব্যাথা	১৩ (৪৩)
বমি বমি ভাব	১২ (৪০)
সার্বজনীন দুর্বলতা	৯ (৩০)
বমি করা	৬ (২০)
ডায়রিয়া (কমপক্ষে দৈনিক তিনবার পাতলা পায়খানা করা)	৬ (২০)
বুকে ব্যাথা (চেস্ট টাইটনেস)	৫ (১৭)
ঘাড় ব্যাথা	৩ (১০)
মাথাঘোরা (ভাড়টিগো)	২ (৭)
অচেতন হয়ে যাওয়া	২ (৭)
অন্যান্য (চোখে ঝাপসা দেখা, গলা ব্যাথা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, বুকে ব্যাথা)	৭ (২৩)
স্কুলে আসার আগে সকালে নাস্তা খেয়েছিলো	২৯ (৯৭)
একসংগে ৫-৮টি বিস্কুট খেয়েছিলো	২২ (৭৩)

প্রাদুর্ভাবের কারণ সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং ঘটনাসমূহের সময় লিপিবদ্ধ করার জন্য দুজন নৃবিজ্ঞানী আক্রান্ত স্কুলসমূহের তিনটি পরিদর্শন করেন (সারণি ৩)। তাঁরা আক্রান্ত শিক্ষার্থী এবং তাদের শিক্ষকদের ১৮টি নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন; শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারের ১১টি অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) সাক্ষাৎকার নেন এবং আক্রান্ত শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকগণ, যাঁরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আক্রান্তদের চিকিৎসা করেছিলেন, তাদের সাথে দুটি আলোচনা অনুষ্ঠান করেন।

সারণি ৩: ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে গাইবান্ধা জেলার আক্রান্ত স্কুলসমূহে ঘটনাবলির সময়

তারিখ (প্রাদুর্ভাবের আনুমানিক সময়) এবং স্কুলের নাম	ঘটনাবলি
অক্টোবর ২৭ (সকাল ১১ টা) কালিতলা দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক স্কুল	প্রথম আক্রান্ত একজন মেয়ে রোগী (ইনডেক্স), যে জীন-ভুতে বিশ্বাসী এবং কালির পরিবর্তনকে একটি ভৌতিক পরিবর্তন হিসেবে মনে করে এবং বিস্কুটগুলোকে তার কাছে বিষাক্ত মনে হয়।
অক্টোবর ৩০ (সকাল ১১ টা) বারোকোনা সরকারি প্রাথমিক স্কুল	প্রথম আক্রান্ত একজন মেয়ে রোগী (ইনডেক্স), যে অক্টোবরের ২৯ তারিখে তার খালার কাছ থেকে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দুটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের বিষাক্ত বিস্কুট খেয়ে আক্রান্ত হওয়ার গল্প শুনে তা তার শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীদের কাছে বর্ণনা করে।
অক্টোবর ৩০ (বিকাল ১ টা) শাবাজেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক স্কুল	মধ্যাহ্ন শিফটের (ডে শিফট) শিক্ষার্থীরা বিস্কুট খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে।
অক্টোবর ৩০ (বিকাল ২ টা) শুজালপুর সরকারি প্রাথমিক স্কুল	মধ্যাহ্ন শিফটের (ডে শিফট) তিনজন শিক্ষার্থী বিস্কুট খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থী, তাদের মাতাপিতা, অভিভাবক, শিক্ষক এবং এলাকার জনগণের ধারণা ছিলো যে, বিস্কুট থেকেই প্রাদুর্ভাবটি সংঘটিত হয়েছিলো। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী এবং তাদের মাতাপিতা প্রাদুর্ভাবের কারণ হিসেবে বিস্কুটের পরিবর্তিত রং, প্যাকেটের গায়ের ল্যাবেলের কালো কালি, তিতা বা ওষুধের মতো স্বাদ বা পচা গন্ধ এবং রক্ষণাবেক্ষণের সম্ভাব্য ভুলসহ উল্লেখযোগ্য কিছু কারণের কথা জানায়। একজন প্রধান শিক্ষক জানান যে, তাঁর নিম্নপদস্থ শিক্ষকেরা কোনো কোনো সময় তাঁকে বলেছেন যে, ২০-২৫ দিন রাখার পর বিস্কুট নরম হয়ে যায়। মাতাপিতা ও অভিবাবকগণ ভীত হয়ে স্বাস্থ্য কর্মসূচির ওপর তাঁদের আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং ফলে তাঁরা তাঁদের শিশুদের কৃমিনাশক ট্যাবলেট খেতে দেন নি। অভিভাবকগণ এতই ভীত ছিলেন যে, অনেকে তাঁদের সন্তানদের অসুস্থতার কোনো লক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। অন্যদিকে একজন মা বলেন যে, তাঁর সন্তানেরা ২০০৭ সাল থেকে এই বিস্কুট খাচ্ছে এবং তাঁর বিশ্বাস বিস্কুটের জন্য প্রাদুর্ভাবটি সংঘটিত হয় নি। প্রধান শিক্ষক এবং অন্য শিক্ষকেরা জানান যে, ইনডেক্স স্কুলে বিস্কুট খেয়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যুর খবরের গুজব খুব দ্রুত অন্যান্য স্কুলে ছড়িয়ে পড়ে, কারণ আক্রান্ত স্কুলগুলোর অবস্থান ছিলো ছোট ছোট গ্রামে। এই গুজবের ফলে মাতাপিতা তাঁদের সন্তানদের স্কুলে গিয়ে ভীড় জমায় এবং মায়েদের কান্না দেখে স্কুলগুলোয় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং সকলের মিলিত এই উদ্বিগ্নতা প্রাদুর্ভাবটিকে অন্যান্য স্কুলেও ছড়িয়ে দেয়। যেসব ডাক্তার আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা করেন তাঁরা প্রাদুর্ভাবটিকে একটি গণমানসিক অসুস্থতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ১০৯ জনের সবাইকেই সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় হাসপাতাল থেকে খালাস দেওয়া হয়।

বিস্কুট বিতরণের আগে প্রাথমিক পর্যায়ে গাইবান্ধা জেলার যে গুদামে রাখা হয়েছিলো অনুসন্ধানী দল সেটি পরিদর্শন করে এবং বিস্কুট প্যাকেট করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার জন্য কাঠামোবিহীন পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি প্রণীত গুণগত মান বজায় রাখতে সমর্থ কিছু অনুমোদিত স্থানীয় কারখানায় উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কিস্কুট তৈরি করা হয়। দলটি দৈবচয়নের ভিত্তিতে বিস্কুটের কিছু প্যাকেট নিয়ে সংরক্ষণের গুণগতমান পরীক্ষা করে এবং গুদামের ব্যবস্থপনা সঠিক ছিলো বলে মনে করে। দলের সদস্যরা স্কুলের সংরক্ষণের স্থানও পরিদর্শন করেন, কিন্তু পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত কোনো বিস্কুট তাঁরা দেখেন নি। এছাড়া অনুজীবীয় বিশ্লেষণের জন্য তাঁরা আক্রান্ত স্কুলসমূহ, গুদামঘর এবং একজন ছাত্রের কাছ থেকে বিস্কুটের নমুনা সংগ্রহ করেন।

তিনজন পরিবেশ অনুজীববিজ্ঞানী স্থানীয় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য সন্দেহজনক রোগী, স্বাস্থ্যকর্মী, ক্ষতিগ্রস্থ জেলায় কর্মরত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির কর্মচারী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী, স্কুল শিক্ষক এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাঠামোবিহীন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তাঁরা বাড়ির চাপকল, সন্দেহজনক রোগীদের খাবার পানি সংরক্ষণ করার পাত্র এবং আক্রান্ত স্কুলসমূহের চাপকল থেকে পানির নমুনা সংগ্রহ করেন। তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য তাঁরা একই বয়সী ছেলেমেয়ে, যারা বিস্কুট খেয়ে প্রাদুর্ভাবে আক্রান্ত হয় নি (নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী), তাদের বাড়ির চাপকল এবং খাবার পানি সংরক্ষণ করার পাত্র থেকেও পানির নমুনা সংগ্রহ করেন। সন্দেহজনক রোগী এবং নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার্থী উভয় শ্রেণী থেকে তাঁরা মলের নমুনাও সংগ্রহ করেন। বরফের সাহায্যে প্যাকেট করে সবগুলো নমুনা একটি ইনসুলেটেড বাক্সে রেখে আইসিডিডিআর,বি-র এনভায়রনমেন্টাল মাইক্রোবায়োলোজি ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় এবং সংগ্রহের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

সন্দেহজনক রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত ২৬টি মলের নমুনা এবং নিয়ন্ত্রণ শ্রেণীর কাছ থেকে সংগৃহীত ২৮টি মলের নমুনা থেকে *ভিবরিও কলেরি*, *শিগেলা* অথবা *সালমোনেলার* মতো কোনো রোগের জীবাণু পাওয়া যায় নি। তবে রোগী এবং নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মোট ৫৬টি মলের নমুনা থেকে চারজন রোগী এবং নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্য থেকে পাঁচজনের মলে *জিয়ারডিয়া ল্যাম্বলিয়া*, *এন্টামোবা হিস্টোলাইটিকা/এন্টামোবা ডিসপার*, *অ্যাসকারিস লুমব্রিকয়েডস* এবং *এন্টারোবিয়াস ভারমিকুলারিস* নামক কিছু কৃমি সনাক্ত করা হয়। সন্দেহজনক রোগীদের বাড়ির ২৫টি চাপকলের পানির নমুনার মধ্যে নয়টি (৩৬%) এবং তারা যে পানি ব্যবহার করতো সেসব পানির ২৬টি নমুনার মধ্যে ২৪টি (৯২%) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাইক্রোবায়াল গুণাগুণ নীতিমালা অনুযায়ী পান করার অযোগ্য প্রমাণিত হয়। তেমনি নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর বাড়ির ৩৫% চাপকলের পানির নমুনায় এবং যেসব পানি তারা ব্যবহার করতো সেসব পানির ৮৬% নমুনায় দেখা গেছে, সেগুলোও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান বজায় রাখতে ব্যর্থ ছিলো (সারণি ৪)।

সারণি ৪: বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত পানির জীবাণু পরীক্ষার ফলাফল

নমুনার সূত্র	ফিকেল কলিফর্মের সীমা অতিক্রমকারী নমুনার সংখ্যা[১]	ফিকেল স্ট্রেপটোকক্কির সীমা অতিক্রমকারী নমুনার সংখ্যা[২]	ক্লোস্ট্রিডিয়াম পারফিঞ্জের সীমা অতিক্রমকারী নমুনার সংখ্যা[৩]
স্কুলের চাপকল (৪টি)	১	২	০
সংরক্ষিত খাবার পানি (সন্দেহজনক রোগী) (২৬টি)	১৮	২১	২
চাপকল (সন্দেহজনক রোগী) (২৫টি)	৪	৯	১
সংরক্ষিত খাবার পানি (কন্ট্রোল) (২৯টি)	১৮	২৪	৫
চাপকল (কন্ট্রোল) (২৮টি)	৫	৭	১

[১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী ফিক্যাল কলিফর্মের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা - ০ সিএফইউ/১০০এমএল
[২] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী ফিক্যাল স্ট্রেপটোকক্কির সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা - ০ সিএফইউ/১০০এমএল
[৩] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী ক্লোসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেস সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা - ০ সিএফইউ/১০০এমএল

সংগৃহীত বিস্কুটের নমুনার মাইক্রোবায়োলোজিক্যাল পরীক্ষায় দেখা যায় যে, এগুলোতে টোটাল কলিফর্ম, ফিক্যাল কলিফর্ম, ফিক্যাল স্ট্রেপটোকক্কি এবং টোটাল এরোবিক ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রায় ছিলো।

প্রতিবেদন: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রোগ্রাম অন ইনফেকশাস ডিজিজেজ অ্যান্ড ভ্যাকসিন সায়েন্সেস, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা; সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র; বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি

মন্তব্য

রোগতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, পরিবেশগত এবং ল্যাবোরেটরি পরীক্ষার ফলাফল থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, গাইবান্ধা জেলায় স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘটিত আলোচ্য প্রাদুর্ভাবটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্কুট খাওয়ার ফলে হয় নি বরং প্রাথমিকভাবে তা ছিলো একটি গণমনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা। দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ার পর দ্রুত আবার সেরে ওঠা এবং খাদ্যে বিষক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যহীন স্বাস্থ্যগত, ল্যাবরেটরি এবং পরিবেশ-সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, এটি ছিলো গণমনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা, খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত নয়। এই প্রাদুর্ভাবটি গত দু বছরে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া অন্যান্য গণমনস্তাত্ত্বিক প্রাদুর্ভাবের সাথে বেশ সংগতিপূর্ণ (১০)। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বিস্কুট খেয়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যু-সংক্রান্ত গুজব, বিস্কুটের প্যাকেটে কালো কালির ল্যাবেলিং, বিস্কুটের রং এবং এলাকার মানুষের উদ্বিগ্নতা, ইত্যাদি সম্ভবত এই গণমনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতাজনিত প্রাদুর্ভাবটি ছড়াতে সাহায্য করেছে।

তবে স্কুলে সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করার ফলে বিস্কুটের গুনাগুণ নষ্ট হয়ে থাকতে পারে, যার ফলে কিছু বিস্কুট পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত হতে পারে এবং যা খেয়ে কিছু শিক্ষার্থীর পেটের পীড়া হতে পারে। অনুসন্ধানকারীগণ সংগৃহীত বিস্কুটের নমুনায় যদিও কোনো ধরনের মাইক্রোবায়োলোজিক্যাল দূষণ পান নি, তথাপি তাঁরা এ-ধরনের কিছু দূষণের সম্ভাব্যতা উড়িয়েও দিতে চান না, কারণ তাঁরা প্রাদুর্ভাবের

দিন বিস্কুট সংগ্রহ করতে পারেন নি। এছাড়া, সংগৃহীত পানির নমুনার অর্ধেকেরও বেশিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত মান বজায় ছিলো না। এ থেকে বোঝা যায় যে, পেটের পীড়া-সংক্রান্ত কোনো ধরনের সংক্রমণের ফলে যদি প্রাদুর্ভাবটি সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে তা হতে পারে ওই পানি থেকে।

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার চাদপুর আরেফিয়া সরকারি প্রাথমিক স্কুলে অনুসন্ধানকারীগণ কোনো অনুসন্ধান চালান নি, কারণ প্রাথমিক অনুসন্ধানে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে, ওইদিন বিস্কুট না খেয়েই ৩৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বুক এবং ঘাড় ব্যাথার মতো মৃদু লক্ষণ ছিলো।

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাজমান বিশাল অপুষ্টির সমস্যা মোকাবেলায় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির বিস্কুট বিতরণ কার্যক্রম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং এ কর্মসূচি চালু থাকা উচিত। গত দু বছরে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্কুটের বিষাক্ততার সন্দেহে সংঘটিত যেসব প্রাদুর্ভাব আইইডিসিআর কর্তৃক নির্ণীত হয়েছে, সেগুলোর তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ-ধরনের প্রাদুর্ভাব ওই এলাকায় আবারো সংঘটিত হতে পারে। বিস্কুটের গুনাগুণ সম্পর্কে আশ্বাস প্রদান এবং ভবিষ্যতে যাতে আর কোনো প্রাদুর্ভাব না ঘটে তার জন্য অনুসন্ধানের ফলাফল শিক্ষার্থী, তাদের মাতাপিতা, অভিভাবক এবং স্কুল এলাকার সবাইকে জানানো উচিত। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি কর্তৃক বিতরণকৃত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্কুট খাওয়া অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষার্থী এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে অনুপ্রাণিত করতে সঠিক স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক নিয়মিত কর্মসূচি পরিচালনা করা উচিত। স্কুলে বিস্কুটের গুনাগুণ নিশ্চিত করতে সদাসতর্ক নজর রাখা উচিত, বিশেষ করে বৃষ্টি বা ভেজা মওসুমে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যের সাথে বিশুদ্ধ পানি যেখানে একটি পূর্বশর্ত (১১), সেখানে পরিবেশগত বিষয় (নিরাপদ পানির যোগান এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) এবং নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুত ও সম্পুরক খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার দিকে নজর রাখলে তা খাদ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে ভবিষ্যতে খাদ্যবাহিত রোগ প্রতিরোধে বাড়তি পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করতে পারে।

References

1. Jones TF, Craig AS, Hoy D, Gunter EW, Ashley DL, Barr DB, *et al*. Mass psychogenic illness attributed to toxic exposure at a high school. *N Engl J Med* 2000;342:96-100.
2. Bartholomew RE. "Mystery illness" at Melbourne airport: toxic poisoning or mass hysteria? *Med J Aust* 2005;183:564-6.
3. Dhadphale M, Shaikh SP. Epidemic hysteria in a Zambian school: "the mysterious madness of Mwinilunga". *Br J Psychiatry* 1983;142:85-8.
4. Amin Y, Hamdi E, Eapen V. Mass hysteria in an Arab culture. *Int J Soc Psychiatry* 1997;43:303-6.
5. Mattoo SK, Gupta N, Lobana A, Bedi B. Mass family hysteria: a report from India. *Psychiatry Clin Neurosci* 2002;56:643-6.
6. Balaratnasingam S, Aleksandar J. Mass hysteria revisited. *Curr Opin Psychiatry* 2006;19:171-4.
7. Ali-Gombe A, Guthrie E, McDermott N. Mass hysteria: one syndrome or two? *Br J Psychiatry* 1996;168:633-5.
8. Ahmed AU. Impact of feeding children in school: evidence from

Bangladesh. Washington, DC: International Food Policy Research Institute, 2004. 64 p.

9. Ahmed AU, Del Ninno C. The Food for education program in Bangladesh: an evaluation of its impact on educational attainment and food security. Washington, DC: International Food Policy Research Institute, 2002. (FCND Discussion Paper 138).

10. International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. Outbreak of mass sociogenic illness in students in secondary schools in Bangladesh during July-August 2007. *Health Sci Bul* 2008;6:6-12.

11. Kung'u JK, Boor KJ, Ame SM, Ali NS, Jackson AE, Stoltzfus RJ. Bacterial populations in complementary foods and drinking-water in households with children aged 10-15 months in Zanzibar, Tanzania. *J Health Popul Nutr* 2009; 27:41-52.

বাংলাদেশে কমপুষ্টি: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশে কমপুষ্টি একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হিসেবে বিরাজমান। শিশুদের মধ্যে কমপুষ্টির হার যদিও কমেছে, তথাপি পাঁচবছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে কম ওজনের (বয়স অনুযায়ী ওজন: <-২ জেড স্কোর) শিশুর হার ৪১%। কমপুষ্টি পাওয়া শিশুর সংখ্যা কমার হার কম (বছরে মাত্র ১.২৭%) হওয়াতে বাংলাদেশের পক্ষে কমপুষ্টি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানজনিত শহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) অর্জন করার সম্ভাবনা কম। টেকসই উন্নয়নের জন্য কমপক্ষে ৭০% জনগোষ্ঠির মধ্যে সরাসরি পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ইন্টারভেনশন চালু থাকা প্রয়োজন, যেমন শিশুদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো এবং তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী পরিপূরক খাদ্য খাওয়ানোর জন্য আরো বেশি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচারাভিযান চালানো এবং একাজে প্রয়োজনীয় সমর্থন যোগানো, তাদেরকে প্রয়োজনীয় অণুপুষ্টির যোগান দেওয়া, কৃমিমুক্ত রাখা, এবং স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন সাধন। এছাড়া, সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অবস্থা উন্নয়নের জন্য পরিবারের আয়, কৃষি উৎপাদন, মেয়েদের শিক্ষা এবং লিঙ্গসমতা বৃদ্ধিজনিত ইন্টারভেনশন অত্যন্ত জরুরী।

অপুষ্টি বলতে কমপুষ্টি এবং অতিপুষ্টি উভয়ই বোঝায়। কমপুষ্টি বলতে প্রোটিন-এনার্জিজনিত অপুষ্টি এবং অণুপুষ্টিজনিত ঘাটতি, যথা – প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজদ্রব্যের ঘাটতিকে বোঝায় (১)। বাংলাদেশের কমপুষ্টিজনিত বর্তমান অবস্থার একটি পর্যালোচনা আলোচ্য নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে (১) (চিত্র ১)। পৃথিবীব্যাপী ৩৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে কমপুষ্টি এবং পাঁচবছরের কম-বয়সী শিশুদের রোগাক্রান্ত হওয়ার ৩৫% কারণও এই কমপুষ্টি (২)। শিশু ও মায়ের কমপুষ্টির কারণে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রসহ অর্থনীতি, স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এক মারাত্মক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ (৩)। কমপুষ্টিজনিত সমস্যা মারাত্মক, দীর্ঘস্থায়ী, বংশানুক্রমিক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরিবর্তনীয়, যার ফলে অসুস্থতা ও মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায় এবং বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক যোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা কমে যায়। এর সবকিছুরই বিরূপ প্রভাব রয়েছে জাতীয় আয় এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর (৩)। বৈশ্বিক মোট ডিজএবিলিটি

-অ্যাডজাস্টেড লাইফ ইয়ারস (ডিএএলওয়াই) এর ১১% নষ্ট হয় শুধুমাত্র শিশু বয়সে অপুষ্টির কারণে (২)।

চিত্র ১: পুষ্টিহীনতার শ্রেণীবিন্যাস

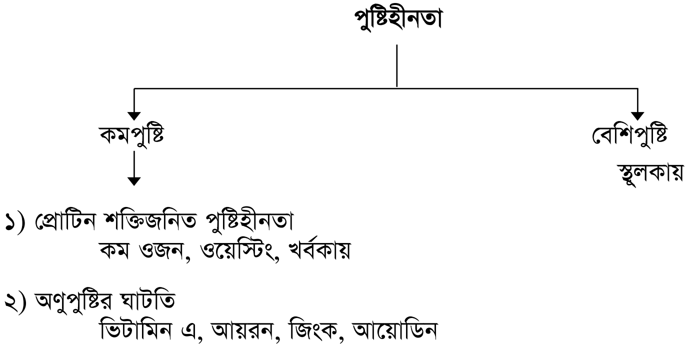

কমপুষ্টি পরিমাপক

শিশুদের বিকাশ পরিমাপের জন্য সাধারণত তিনটি মাপকাঠি ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো – 'বয়স অনুযায়ী উচ্চতা', 'উচ্চতা অনুযায়ী ওজন' এবং 'বয়স অনুযায়ী ওজন'। এই তিনটির স্বল্পতা শিশুর বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে। বয়স অনুযায়ী কম উচ্চতা সাধারণত খাটো/খর্বাকৃতি অথবা দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টিহীনতা হিসেবে পরিচিত। এটি শিশুদের স্বাভাবিক লম্বা হওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার ফলস্বরূপ, যা খারাপ স্বাস্থ্য অথবা কমপুষ্টিজনিত কারণে হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত কম-বয়সী অর্থাৎ দু থেকে তিন বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে এটি বিকাশ বাধাগ্রস্থ হওয়ার চলমান প্রক্রিয়া, অন্যদিকে বড় শিশুদের ক্ষেত্রে এর জন্য তাদের বিকাশ বাধাগ্রস্থ বা তারা ইতোমধ্যে খর্বকায় হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। 'উচ্চতা অনুযায়ী কম ওজন' সাধারণত রোগাক্রান্ত অবস্থা অথবা ভীষণ অপুষ্টিজনিত সমস্যা হিসেবে পরিচিত। এটি দ্বারা হালকা-পাতলা শারীরিক গঠন (ওয়েস্টিং) বোঝায় যা সাম্প্রতিক ওজন কমার নির্দেশক এবং রোগ ও ক্ষুধার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো খাদ্য ঘাটতি না থাকলে ওয়েস্টিং-এর হার সাধারণত শতকরা পাঁচভাগেরও কম থাকে, এমনকি স্বল্পআয়ের দেশেও। ওয়েস্টিং-এর হার ১০-১৪%-কে মারাত্মক এবং ১৫%-এর বেশিকে অত্যন্ত সংগীন হিসেবে বিবেচনা করা হয় যেখানে জনস্বাস্থ্যজনিত ইন্টারভেনশন চালু করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে (৪)। 'বয়স অনুযায়ী ওজন' শিশুর বয়স অনুযায়ী ওজনের অনুপাতকে বোঝায়। এটি শিশুর উচ্চতা (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা) এবং ওজন (উচ্চতা অনুযায়ী ওজন) উভয় দ্বারাই প্রভাবিত। অতএব একটি কমওজনবিশিষ্ট শিশু খর্বকায় বা ওয়েস্টেড কি না বা উভয় অবস্থার শিকার কি না তা ওই শিশুর বয়স অনুযায়ী ওজনের হিসাব দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বেশিরভাগ স্বল্পোন্নত দেশে তিন বছরের বেশি-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী কম ওজন হয় প্রধানত খর্বাকৃতি হওয়ার জন্য, যদিও দুর্ভিক্ষপীড়িত পরিবেশে বয়স অনুযায়ী কম ওজন হয় সাধারণত ওয়েস্টিং-এর কারণে (৫)।

কমপুষ্টি বাংলাদেশে একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হিসেবে বিরাজমান (৬)। ১৯৮৯-১৯৯০ সালে কম ওজনবিশিষ্ট শিশুদের হার (যা পাঁচবছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে বয়স অনুযায়ী ওজন <-২ জেড স্কোরকে বোঝায়) ৬৫%-এর বেশি ছিলো (৭) (চিত্র ২)। যদিও এই হার ২০০০ সালে

কমে ৪৭%-এ নেমে এসেছে, কিন্তু তারপর থেকে এই কমার হার খুবই নগণ্য। সম্প্রতি জাতীয় পুষ্টি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পাঁচবছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে কমপুষ্টি পাওয়া শিশুদের হার ৪১% (৬)।

চিত্র ২: বাংলাদেশে পাঁচবছরের কম-বয়সী শিশুদের কমপুষ্টির শতকরা হারের গতিধারা

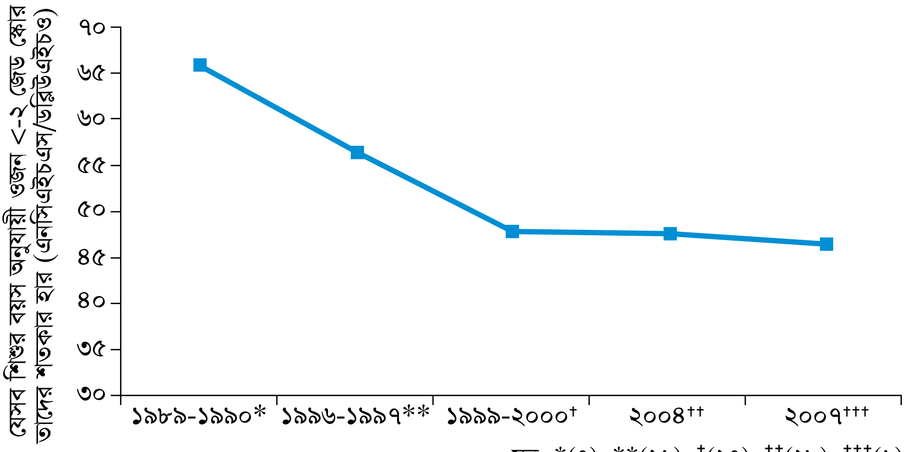

সুত্র: *(৭), **(২৬), ⁺(২৭), ⁺⁺(২৮), ⁺⁺⁺(৬)

পাঁচবছরের কম-বয়সী ৪৩% শিশু খর্বকায় (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা <-২ জেড স্কোর), ১৭% শিশু হালকা-পাতলা (ওয়েস্টেড) এবং ৩.৪% মারাত্মকভাবে কম ওজনবিশিষ্ট (৬,৮)। এই হিসাব অনুযায়ী দেশে মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত মোট শিশুর সংখ্যা পাঁচ লাখেরও বেশি। তাছাড়া, বাংলাদেশে কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করা শিশুদের হার যদিও ৪০% থেকে কমেছে, তথাপি এই হার এখনো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি হারবিশিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (রেঞ্জ ২০-২২%) (৯-১১)। এই শিশুরা মৃত্যুঝুঁকির মধ্যে রয়েছে অথবা তাদের বিকাশ ও উন্নয়ন মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে আছে।

বাংলাদেশে মহিলারা পুষ্টির ক্ষেত্রে শিশুদের থেকে একটু ভালো অবস্থানে রয়েছে। ১৯৯৭ সালে ৫২% মহিলার দীর্ঘমেয়াদী এনার্জি ঘাটতি ছিলো (বডি মাস ইনডেক্স = <১৮.৫ কেজি/মিটার^{২})। দশ বছর পর দীর্ঘমেয়াদী এনার্জি ঘাটতির এই হারে একটি উল্লেখযোগ্য কমতি পরিলক্ষিত হচ্ছে (২০০৭ সালে ৩০%) (৬)।

অণুপুষ্টিজনিত ঘাটতি

অণুপুষ্টিজনিত অপুষ্টিকে প্রায়ই 'লুকানো ক্ষুধা' হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, কারণ এই ধরনের অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো প্রায়ই খালি চোখে বোঝা যায় না। চারটি অণুপুষ্টি আছে যেগুলোর সাথে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি সরাসরি সম্পৃক্ত। এগুলো হলো - ভিটামিন এ, আয়রন, আয়োডিন এবং জিংক। ভিটামিন এ-এর ঘাটতির ফলে যেসব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে চোখের জেরোফথালমিয়া, যার পরিণাম অন্ধত্ব (রাতকানা, বিটটস স্পট, কর্নিয়ায় জেরোসিস এবং জেরোফথালমিয়া)। এছাড়া অস্পষ্ট সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে রক্তস্বল্পতা, রোগ প্রতিরোধে অকার্যকারিতা ও রোগ সংক্রমণের

প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি, দুর্বল বিকাশ বা বৃদ্ধি এবং মৃত্যু (৫)। ১৯৮০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে স্কুলগামী হওয়ার আগের বয়সী শিশুদের মধ্যে রাতকানা রোগের ব্যাপকতা নাটকীয়ভাবে কমেছিলো, যা ছিলো ১৯৭৩ সালে শুরু হওয়া (১২-১৫) শিশুদেরকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর কর্মসূচির ফলস্বরূপ। বর্তমানে এই কর্মসূচির আওতায় ৮৮% শিশুকে আনা সম্ভব হয়েছে (৬)। তবে প্রসব পরবর্তী মায়েদের মধ্যে ভিটামিন এ ক্যাপসুল কভারেজ খুব কম, মাত্র ২০% (৬)।

পৃথিবীব্যাপী সবচেয়ে বেশি পুষ্টিজনিত সমস্যাসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে আয়রন ঘাটতিজনিত অপুষ্টি। জনগণের ওপর পরিচালিত গবেষণায় অথবা চিকিৎসা কেন্দ্রে রক্তস্বল্পতা নির্ধারণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যেকার আয়রন ঘাটতি নির্ধারণ করা হয়, যদিও আয়রন ঘাটতি রক্তস্বল্পতার সুস্পষ্ট কারণ নয়। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, আয়রন ঘাটতি ৫০% রক্তস্বল্পতার জন্য দায়ী (১৬)। অন্যান্য রোগ যেমন – ম্যালেরিয়া, ক্যান্সার, যক্ষ্মা এবং এইচআইভিসহ মারাত্মক এবং দীর্ঘমেয়াদী সংক্রমণও রক্তে হেমোগ্লোবিনের ঘনত্ব কমিয়ে আনতে পারে (১৬)। ২০০৩-২০০৪ সালে পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে ৬-১১ মাস-বয়সী ৯২% শিশু রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত ছিলো এবং রক্তস্বল্পতার ব্যাপকতা ২০০১ থেকে ২০০৪ সালে বেড়ে গিয়েছিলো (১৭)। সে সময় স্কুলগামী বয়সের আগের বয়সী শিশুদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার ব্যাপকতা ছিলো ৬৮%, কিশোরী বালিকাদের মধ্যে ৪০% এবং প্রতি ১০ জন গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে চারজন এতে আক্রান্ত ছিলো, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে (১৭)। বাংলাদেশের জিডিপির আনুমানিক ৭.৯% নষ্ট হয় রক্তস্বল্পতার কারণে (১৭)।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে গলগণ্ড রোগের ব্যাপকতার হার ছিলো ৪৭%, গলগণ্ডসহ জড়বুদ্ধি এবং শরীর বিকৃতির হার ছিলো ০.৫% এবং সাব-ক্লিনিক্যাল আয়োডিনের ঘাটতি (মূত্রে আয়োডিনের ঘনত্ব <১০০ মাইক্রোগ্রাম/লিটার) ছিলো ৭৯% (১৮)। তবে ২০০৪-২০০৫ সালে পরিচালিত সমীক্ষায় আয়োডিন ঘাটতির ব্যাপকতা কমতে দেখা গেছে। তখন ৬-১২ বছর-বয়সী শিশুদের মধ্যে এর ব্যাপকতা ছিলো ৬.২% এবং ১৫-৪৪ বছর-বয়সী মহিলাদের মধ্যে ১১.৭% (১৯)। তবে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি শিশু এবং মহিলাদের মধ্যে এখনও সাব-ক্লিনিক্যাল আয়োডিন ঘাটতি রয়েছে (১৯)।

মানবদেহের বিভিন্ন গঠনমূলক এবং ক্রিয়ামূলক ক্রিটিক্যাল ভূমিকার জন্য জিংক অপরিহার্য। জিংকের এসব উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন এনজাইম পদ্ধতি যা জিনের প্রকাশ, কোষ বিভাজন, বিকাশ/বৃদ্ধি এবং ইম্যিউনোলোজিক ও প্রজনন-সংক্রান্ত কাজ। জনগোষ্ঠির মধ্যে খর্বকায় হওয়ার ব্যাপকতা জিংক ঘাটতির একটি নির্দেশক হিসেবে কাজ করে এবং পাঁচবছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে >২০% খর্বকায় শিশুর হার দেশে জিংক ঘাটতির উচ্চ ঝুঁকির নির্দেশ বহন করে (২)। ২০০৭ সালে বাংলাদেশে পরিচালিত জনমিতিক ও স্বাস্থ্য সমীক্ষার প্রতিবেদনে খর্বাকৃতির ব্যাপকতা ছিলো ৪৩%, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জিংক ঘাটতি বাংলাদেশে একটি বড় ধরনের অপুষ্টিজনিত সমস্যা (৬)। বাংলাদেশে পাঁচবছরের কম-বয়সী এক কোটি ৮৯ লাখ শিশু রয়েছে এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে, ডায়রিয়ার সময় জিংক দ্বারা চিকিৎসায় প্রতি বছর ৩০,০০০-৭৫,০০০ শিশুর জীবন রক্ষা করা যেতে পারে (২০)।

বুকের দুধ এবং পরিপূরক খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস

শিশুদেরকে সঠিক পুষ্টি দেওয়া ও তাদেরকে হৃষ্টপুষ্ট করে বড় করা, এবং তাদের স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের জন্য সঠিকভাবে তাদেরকে খাওয়ানো একটি অপরিহার্য বিষয় (২১)। শিশুদেরকে তাদের জীবনের

প্রথম ছয়মাস শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ এবং দুবছর পর্যন্ত তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরামর্শ প্রদান করে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহে শিশুদেরকে তাদের জীবনের প্রথম ছয়মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ এবং ৬-১১ মাস পর্যন্ত তা চালু রাখলে পাঁচবছরের কম-বয়সী শিশুদের সবধরনের মৃত্যুহার ১৩% প্রতিরোধ করা যেতে পারে বলে মনে হয় (২০)। ছয়মাস পর শিশুর বর্ধিত পুষ্টি চাহিদা অনুযায়ী শুধুমাত্র বুকের দুধ যখন পর্যাপ্ত নয়, তখন স্বাস্থ্যের জন্য যথার্থ নয় এমন খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস স্বল্পোন্নত দেশসমূহে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার বাড়িয়ে দিতে পারে। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো বাংলাদেশে একটি সাধারণ ব্যাপার। এখানে ১২ মাসের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে ৯৯% বুকের দুধ খায় (৬)। তবে ছয়মাসের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ার হার ৪৩%, গত এক দশকে যার কোনো পরিবর্তন হয় নি এবং শিশুদের অপুষ্টি এবং মৃত্যুহারের ওপর এর মারাত্মক প্রভাব রয়েছে (৬)। শতকরা ৪৩ জন নবজাতককে তাদের জন্মের একঘণ্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো হয়। শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ার গড় সময়কাল ৩২.৮ মাস, তবে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ার গড় সময়কাল মাত্র ১.৮ মাস (৬)। বাংলাদেশে শিশুদেরকে পরিপূরক খাবার দেওয়া শুরু হয় অনেক আগে অথবা অনেক দেরি করে এবং যেসব খাবার খাওয়ানো হয় তাও প্রায় সময়ই যথার্থ নয়। এমনকি দুমাসের কম-বয়সী ১৭% শিশুকে বুকের দুধের পরিবর্তে গরুর দুধ বা শিশুদের জন্য তৈরি গুড়ো দুধ খাওয়ানো হয়। শতকরা ছয়জন শিশুকে অন্যান্য তরলজাতীয় খাবার খাওয়ানো হয় এবং আরো ৬% শিশুকে শক্ত অথবা প্রায় শক্ত খাবার খাওয়ানো হয় (৬)। অন্যদিকে ৬-৯ মাস-বয়সী ২৫% শিশুকে বুকের দুধের পাশাপাশি অন্য কোনো শক্ত বা প্রায় শক্ত খাবার দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ার বয়স অতিক্রমকারী শিশুদের মধ্যে মাত্র ৪২% শিশুকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী শক্ত খাবার খাওয়ানো হয়। বাংলাদেশের মতলবে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, পরিপূরক খাবার থেকে শিশুরা যে শক্তি পেয়েছিলো তার পরিমাণ ছিলো সুপারিশকৃত পরিমাণের ৭৪% (২২)। গবেষণাটিতে আরো দেখা যায় যে, ৬-৮ মাস-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে বুকের দুধ এবং সম্পুরক খাবার উভয় থেকে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ ছিলো প্রয়োজনীয় শক্তির ৪৪%, এবং ৯-১২ মাস-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে তা ছিলো ৪৮%। খাদ্যে ভিটামিন ডি-এর পরিমাণ ছিলো সুপারিশকৃত পরিমাণের ১২-১৩% এবং জিংক ছিলো ৪০-৪৫%। আয়রনের পরিমাণ ছিলো খুবই কম -- সুপারিশকৃত পরিমাণের মাত্র ৮-৯%। গবেষণার এই ফলাফলসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে বর্তমানে যে সম্পূরক খাবার শিশুদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে শুধুমাত্র তার পরিমাণ বৃদ্ধি করে শিশুদের অনুপুষ্টিজনিত অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা একটি কঠিন কাজ।

প্রতিবেদক: নিউট্রিশন প্রোগ্রাম, আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

মন্তব্য

পর্যাপ্ত পুষ্টি সুস্বাস্থ্য অর্জন, উন্নত জীবন এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতার একটি পূর্বশর্ত। অপুষ্টির হার কমিয়ে আনার বর্তমান হার কম (বছরে মাত্র ১.২৭%) হওয়াতে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে কম পুষ্টি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানজনিত শহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) অর্জন করার সম্ভাবনা কম। এমনকি কমপুষ্টির ব্যাপকতার এই হার ১৯৯০ সালের অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারলেও বাংলাদেশে এ-হার ৩৩%-এর বেশি থাকবে যা একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্যসম্পর্কিত সমস্যার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং বাৎসরিক উন্নয়নের পথে একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে (২৩)।

অধিকন্তু, গতবছর থেকে চাল এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি দেশের খাদ্যনিরাপত্তা এবং পুষ্টির ক্ষেত্রে মারাত্মক উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি করেছে। বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচির সারিতে (গ্লোবাল হাংগার ইনডেক্স র‍্যাংকিং) বাংলাদেশের স্থান নিচের দিকের ২৫%-এর মধ্যে, যার অর্থ হলো যেকোনো সময়ে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে তা দেশের জন্য একটি বড় ধরনের ঝুঁকি বয়ে আনবে (৮)। ২০০৭-২০০৮ সালের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব পর্যালোচনার জন্য ২০০৮-২০০৯ সালে খাদ্যনিরাপত্তা এবং পুষ্টির ওপর পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখে গেছে যে, পরিস্থির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য কম খাদ্য গ্রহণ ও ঋণ গ্রহণের কৌশল ছাড়াও ২২% পরিবার তাদের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত খরচাদি কমিয়ে এনেছিলো (৮)। সমীক্ষা থেকে আরো জানা যায় যে, শিশু এবং মহিলাদের পুষ্টির অবস্থার সাথে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধিসম্পর্কিত খাদ্যনিরাপত্তার একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে (৮)। বর্তমানে চালের খুচরা মূল্য ২০০৮ সালের সর্বোচ্চ মূল্য থেকেও শতকরা তিনভাগ বেশি, যা শিশু এবং মহিলাদেরকে ক্রমাগতভাবে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে (২৪)।

বাংলাদেশে পুষ্টির অবস্থা উন্নয়নের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উন্নত পুষ্টি ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সুক্ষ্ম ও সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সঠিক ইন্টারভেনশনে তাৎপর্যপূর্ণ বিনিয়োগ। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাশ্রয়ী এবং পরীক্ষিত পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য ইন্টারভেনশন এমনভাবে চালু করা উচিত যাতে অন্ততপক্ষে ৭০% জনগোষ্ঠী এর আওতায় আসে এবং একটি উল্লেখযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল পাওয়া যায় (২৫)। ইন্টারভেনশনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত: শিশুদেরকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য আরো অধিকসংখ্যক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং একাজে প্রয়োজনীয় সমর্থন দেওয়া, শিশুদেরকে সঠিক সম্পুরক খাবার খাওয়ানো, অণুপুষ্টির যোগান দেওয়া, তাদের বিকাশ/বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা, বাড়িতে খাদ্য সমৃদ্ধিকরণের ব্যবস্থা থাকা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসম্পর্কিত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা, শিশুদেরকে কৃমিমুক্ত রাখা, টিকাদান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উন্নয়নের বিস্তৃতি এবং তাতে প্রয়োজনীয় সমর্থন দেওয়া, মা ও নবজাতকের পরিচর্যা করা এবং সেবাকেন্দ্র ও কমিউনিটি পর্যায়ে শিশুদের তীব্র অপুষ্টিজনিত সমস্যা মোকাবেলা করার ব্যবস্থা। মায়ের গর্ভধারণের সময় থেকে শিশুর দ্বিতীয় জন্মবর্ষের এই ৩৩ মাসে মা ও শিশু উভয়ের প্রতি লক্ষ রেখেই এই ইন্টারভেনশনগুলো চালু করা উচিত। জন্মের সময় কমওজনবিশিষ্ট শিশু জন্মের বৃত্ত বন্ধ করার জন্য কিশোরী বালিকা, যাদের অদূর ভবিষ্যতে মা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ইন্টারভেনশনে তাদের প্রতিও লক্ষ রাখা উচিত। দেশের পুষ্টি অবস্থার দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষে সরাসরি ইন্টারভেনশনের পাশাপাশি অপুষ্টির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত বিষয়গুলি যেমন - আয় এবং কৃষিজাত উৎপাদন, লিঙ্গসমতা, মেয়েদের শিক্ষা, এবং নিরাপদ পানির সরবরাহসহ বহুখাতবিশিষ্ট একটি পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

References

1 Gibney MJ, Margetts BM, Kearney JM, Arab L, editors. Public health nutrition. Oxford: Blackwell Science, 2004. 378 p.

2 Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, de Onis M, Ezzati M *et al*. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. *Lancet* 2008;371:243-60.

3 Shekar M, Heaver R, Lee Y-K. Repositioning nutrition as central to development : a strategy for large scale action. Washington, DC: World Bank, 2006. 246 p.

4. World Health Organization. The management of nutrition in major emergencies. Geneva: World Health Organization, 2000. 236 p
5. Semba RD, Bloem MW, editors. Nutrition and health in developing countries. Second edition. New Jersey, USA: Humana Press, 2008. 931 p.
6. National Institute of Population Research and Training. Bangladesh demographic and health survey 2007. Dhaka: National Institute of Population Research and Training, 2009. 346 p.
7. National Institute of Population Research and Training. Bangladesh demographic and health survey 1989-90. Dhaka: National Institute of Population Research and Training, 1990.
8. World Food Programme. Bangladesh household food security and nutrition assessment report 2009. Dhaka: World Food Programme, 2009. 176 p.
9. de Onis M, Blössner M, Villar J. Levels and patterns of intrauterine growth retardation in developing countries. *Eur J Clin Nutr* 1998;52(Suppl 1):S5-15.
10 Ahmed T, Roy SK, Alam N, Ahmed AS, Ara G, Bhuiya AU *et al*. National nutrition program: baseline survey 2004. Dhaka: International Centre for Diarrhoeal Disease Research, 2005. 319 p.
11 United Nations Children Fund. Bangladesh statistics. (http://www.unicef.org/infobycountry/bangladesh_bangladesh_statistics.html, accessed on 31 July 2010)
12 Helen Keller International. Bangladesh nutritional blindness study 1982-83. Dhaka: Helen Keller International, 1985.
13 Helen Keller International. Vitamin A status throughout the lifecycle in rural Bangladesh: national vitamin A survey, 1997-98. Dhaka: Helen Keller International, 1999.
14 Institute of Public Health Nutrition. Nutritional blindness prevention programme: evaluation report 1989. Dhaka: Institute of Public Health Nutrition, 1989.
15 Helen Keller International. Bangladesh in facts and figures 2004. Annual report of the Nutritional Surveillance Project. Dhaka: Helen Keller International, 2005.
16 Benoist dB, McLean E, Egli I, Cogswell M, editors. Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005: Geneva: WHO global database on anaemia, World Health Organization, 2008.
17 Helen Keller International. The burden of anaemia in rural Bangladesh: the need for urgent action. *Nutr Surveillance Project Bull* 2006;16
18 Yusuf HK, Quazi S, Kahn MR, Mohiduzzaman M, Nahar B, Rahman MM *et al*. Iodine deficiency disorders in Bangladesh. *Indian J Pediatr* 1996;63:105-10.

19 Institute of Public Health Nutrition. National iodine deficiency disorders and universal salt iodization survey of Bangladesh 2004-5. Dhaka: Institute of Public Health Nutrition, 2005.

20 Jones G, Steketee RW, Black RE, Bhutta ZA, Morris SS. How many child deaths can we prevent this year? *Lancet* 2003;362:65-71.

21 Kumar D, Goel NK, Mittal PC, Misra P. Influence of infant-feeding practices on nutritional status of under-five children. *Indian J Pediatr* 2006;73:417-21.

22 Kimmons JE, Dewey KG, Haque E, Chakraborty J, Osendarp SJ, Brown KH. Low nutrient intakes among infants in rural Bangladesh are attributable to low intake and micronutrient density of complementary foods. *J Nutr* 2005;135:444-51.

23 Ahmed T. Policy brief on children and maternal nutrition in Bangladesh. In: National Institute of Population Research and Training. Bangladesh demographic and health survey 2007. Dhaka: National Institute of Population, Research and Training, 2009:13-5.

24 World Food Programme. Bangladesh Food Security Monitoring Bulletin: special issue, January 2011. Dhaka: World Food Programme, 2011. 4 p.

25 Bhutta ZA, Ahmed T, Black RE, Cousens S, Dewey K, Giugliani E *et al*. What works? Interventions for maternal and child undernutrition and survival. *Lancet* 2008;371:417-40.

26 Mitra SN, Ahmed Al-Sabir, Cross AR. Bangladesh demographic and health survey 1996-97. Dhaka: National Institute of Population Research and Training, 1997. 252 p.

27 National Institute of Population Research and Training. Bangladesh demographic and health survey 1999-2000. Dhaka: National Institute of Population Research and Training, 2001. 280 p.

28 National Institute of Population Research and Training. Bangladesh demographic and health survey 2004. Dhaka: National Institute of Population Research and Training, 2005. 339 p.

এক স্বাস্থ্য (ওয়ান হেলথ) ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন

মানুষ ও পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং পরিবেশ বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সমস্ত প্রাণীর স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য 'এক স্বাস্থ্য উদ্যোগ' (ওয়ান হেলথ ইনিশিয়েটিভ) একটি বৈশ্বিক আন্দোলন। একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্য, কৃষি এবং বৃহত্তর পরিবেশগত উন্নয়ন ছাড়া আমরা একটি স্বাস্থ্যবান জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারি না। বাংলাদেশে জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব, জীবনধারণ এবং পুষ্টির জন্য কৃষির গুরুত্ব, গৃহপালিত পশু ও পরিবেশের সাথে মানুষের ঘনিষ্ট সংস্পর্শ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পরিবেশের ওপর চাপ, ভূমির ব্যবহারে পরিবর্তন এবং শিল্প ও রাসায়নিক দূষণের কারণে এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশে এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো মানুষ ও পশুর স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রণালয়গুলো আলাদা। এক স্বাস্থ্য সহযোগিতাকে সার্থকভাবে আনুষ্ঠানিক রূপরেখা দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।

মানুষের স্বাস্থ্য নির্ভর করে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের ওপর। একটি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ উন্নত শস্য এবং গৃহপালিত পশু উৎপাদনে কৃষককে সহায়তা করে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী যারা একত্রে এই গ্রহে বাস করে তাদের জন্য পরিষ্কার পানি এবং বাতাস দেয়। মানুষ ও পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং পরিবেশ বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সমস্ত প্রাণীর স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য 'এক স্বাস্থ্য উদ্যোগ' (ওয়ান হেলথ ইনিশিয়েটিভ) একটি বৈশ্বিক আন্দোলন (১)। এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একটি সম্প্রসারিত সমন্বিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। রোগীর চিকিৎসাসেবার জন্য আলাদা হাসপাতাল বা ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা, অসুস্থ পশুর চিকিৎসায় আলাদা চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং পৃথিবীর নাজুক পরিবেশের মধ্যে নির্ধারিত কিছু স্থান সংরক্ষণের জন্য আলাদাভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করার পরিবর্তে এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উল্লিখিত বিষয়গুলোর একটির সাথে আরেকটির সম্পৃক্ততা সমর্থন করে, যার জন্য একটি সম্মিলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অপরিহার্য। এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরো স্বীকার করে যে, নদী, সাগর, বাতাস উদ্ভিদ এবং পশুসহ পৃথিবীর সম্পদসমূহ একটির সাথে আরেকটি সম্পৃক্ত যেগুলো মানুষের দ্বারা তৈরি রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে। সুতরাং এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নজিরবিহীন সহযোগিতা প্রয়োজন।

এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিশেষ করে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য, একটি প্রাসংগিক বিষয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি, যেখানে দেশটি একটি ছোট্ট নগররাষ্ট্র নয়। জনসংখ্যার এত ঘনত্বের পরেও বাংলাদেশের অধিকাংশ খাদ্য দেশেই উৎপাদিত হয় (২), এবং যে জমিতে এই খাদ্য উৎপাদিত হয় সেখানে প্রায়ই অনানুপাতিক হারে কীটনাশক ব্যবহৃত হয় (৩), এবং শিল্পবর্জ্য দ্বারা তা ক্রমবর্ধমানহারে দূষিত হচ্ছে (৪)। বাংলাদেশে খাবার পানির সবচেয়ে ব্যবহৃত সূত্র হচ্ছে চাপকল। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী নিরাপদ খাবার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা যতটুকু থাকার কথা মোট চাপকলের অর্ধেকে তার থেকে অধিক মাত্রায় আর্সেনিকের দূষণ রয়েছে (৫), এবং চাপকল থেকে যতগুলো খাবার পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিলো তার ৪০% ছিলো

জীবাণু দ্বারা দূষিত (৬)। বেশিরভাগ বাংলাদেশী তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য যেকোনো উপায়ের থেকে কৃষিজাত পণ্যের ওপর বেশি নির্ভর করে। বাংলাদেশের জনসাধারণের তাদের গৃহপালিত পশুর সাথে ঘনিষ্ট সংস্পর্শ রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের ৬১% খানার জনগণ হাঁস-মুরগী পালন করে এবং এদের অর্ধেকসংখ্যক খানার জনগণ তাদের নিজেদের ঘরের মধ্যেই সেগুলো পালন করে (৭)।

বাংলাদেশে হাঁস-মুরগীর প্রকল্পসমূহ মানুষ, পশু এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি করে। বাংলাদেশে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হাঁস-মুরগীর অবদান গুরত্বপূর্ণ। হাঁস-মুরগীর মাংস এবং ডিম উচ্চ মাত্রার পুষ্টিহীন জনগোষ্ঠিকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে (স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার এই সংখ্যায় পুষ্টির ওপর প্রকাশিত অন্য নিবন্ধ দেখুন)। হাঁস-মুরগী পালন স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠির আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উপায়। বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশসহ এশিয়া মহাদেশে হাঁস-মুরগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশালসংখ্যক গৃহপালিত এই হাঁস-মুরগী পরিবেশে নতুন রোগ-জীবাণুর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সংক্রামিত হাঁস-মুরগী এবং সেগুলো থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদির মাধ্যমে এবং সম্ভবত জলচর পাখি যেগুলো প্রতিবছর এক দেশ থেকে অন্য কোনো দেশে যায়, সেগুলোর মাধ্যমে ১৯৯৭ সাল থেকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাসের সাবটাইপ এইচ৫এন১ জীবাণু এশিয়া, আফ্রিকা এবং এমনকি ইউরোপের অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

২০০৭ সাল থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এইচ৫এন১ বাংলাদেশে গৃহপালিত হাঁস-মুরগীর মধ্যে বারবার প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করেছে যার ফলে অনেক হাঁস-মুরগী মারা গেছে। উৎপাদনকারীদের অনেকে তাদের সমস্ত হাঁস-মুরগী খুইয়েছে। মানুষও ইনফ্লুয়েঞ্জার এই বিশেষ জীবাণুর সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে আছে। বিশ্বব্যাপী এইচ৫এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জায় নিশ্চিত আক্রান্ত ৫০০ রোগীর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি মারা গেছে (৮)। এইচ৫এন১ ভাইরাস যদি সার্থকভাবে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে সংক্রমণ ঘটানোর মতো শক্তি অর্জন করতে পারে অর্থাৎ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস যদি মানুষের মধ্যে আরো খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়, তাহলে বিশ্ব একটি সর্বনাশা মহামারীর কবলে পড়তে পারে। এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হাঁস-মুরগী উৎপাদনকারীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার চেষ্টা করবে যাতে তারা খামার প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করবে এবং অন্যদিকে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেবে। এই ব্যবস্থা একইসাথে এমনভাবে হাঁস-মুরগী চাষের উৎসাহ যোগাবে যাতে হাঁস-মুরগী থেকে মানুষের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়ানোর ঝুঁকি কমে যায়।

বাংলাদেশে এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে দুটি বড় বাধা আছে। প্রথমত, এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা যা ব্যাপকভাবে পরিচিত নয়। আসলে মানুষের স্বাস্থ্য যেখানে প্রধানত আমাদের শারীরিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি, সেখানে বাংলাদেশে মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সবচেয়ে সাধারণ ভাবনা হচ্ছে যে, এটি প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসাসেবা নেওয়ার ব্যাপার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দেখার বিষয়। এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজন জনস্বাস্থ্যসম্পর্কিত একটি বৃহদাকার অবকাঠামো, স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য অধিকতর উন্নত একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ ওই বিষয়গুলোর প্রতি আরো নজর দেওয়া ও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা যা উল্লিখিত ব্যবস্থা চালু করতে সর্বাধিক সাহায্য করে। বাংলাদেশে এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বড় বাধাটি হলো, বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একে অপরের সাথে ন্যূনতম যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে যার যার কর্মসূচি অনুযায়ী আলাদা আলাদাভাবে কাজ

করা। মন্ত্রণালয়গুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আলাদা। উদাহরণস্বরূপ, এর অর্থ হচ্ছে, জেলা পর্যায়ের একজন স্বাস্থ্য অফিসারের সাথে সমপর্যায়ের একজন পশুপালন অফিসারের যোগাযোগ এবং সহযোগিতার উৎসাহ খুব কম দেখা যায়। তাঁদের কাজ তদারকির জন্য আলাদা প্রশাসনিক অবকাঠামো এবং উৎসাহ রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কর্তব্যরত ডাক্তারগণ প্রায়ই একে অন্যকে চিনেন, কারণ তাঁরা হয় একই মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করেছেন অথবা কর্মক্ষেত্রে পূর্বে একসংগে কাজ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। তবে সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে এ-ধরনের সামাজিক যোগাযোগ খুব কমই দেখা যায়।

একদল আগ্রহী পেশাজীবী 'এক স্বাস্থ্য বাংলাদেশ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছেন যা এক স্বাস্থ্যসম্পর্কিত ধারণা এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। বিগত দুবছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর কিছু পেশাজীবী চট্টগ্রাম ও ঢাকায় অনুষ্ঠিত ছয়টি সম্মেলনে যোগদান করেছেন (তিনটি চট্টগ্রামে এবং তিনটি ঢাকায়)। এসব সম্মেলনে এক স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক এবং নীতিনির্ধারণী বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এসব সম্মেলনের কতিপয় উপস্থাপনায় মানুষের মধ্যে পরিবাহী পশুর রোগ এবং মানুষ ও পশু উভয়ের মধ্যে সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম রোগব্যাধির কথা তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে সংঘটিত সাম্প্রতিক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিপাহ এবং অ্যানথ্রাক্স প্রাদুর্ভাব পশু ও মানুষের স্বাস্থ্যের মধ্যেকার যোগসূত্রের কথা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছে এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের একত্রে কাজ করার গুরুত্বসম্পর্কিত নির্দিষ্ট কিছু স্থানীয় উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ একটি আঞ্চলিক এক স্বাস্থ্য ফোরাম গঠনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে যেখানে কতিপয় প্রতিবেশী দেশ থেকে মানুষ ও পশুর স্বাস্থ্যের প্রতিনিধিত্বকারীগণ একত্রে বসে তাদের সবার সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে একটি সুষ্ঠু সমাধানের দিক নির্দেশনা তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বড় ধরনের কাজ শুরু করেছে যাতে দেশের পরিবেশ, কৃষি এবং মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজ একসংগে চলতে পারে। বাংলাদেশ এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে লাভবান হতে চাইলে সরকারের মধ্যে কিছু প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রয়োজন। প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধান এবং মোকাবেলার জন্য সহযোগিতামূলক কার্যক্রম সরকারের কাজের অন্তর্ভুক্ত, যা একটি পরিব্যাপ্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগ-জীবাণু বা বিষ (টক্সিন) গৃহপালিত পশু অথবা শস্য এবং মানুষের মধ্যে সংক্রমণের ফলে বাংলাদেশে প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধির যেসব প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় সে-সংক্রান্ত প্রতিবেদন স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যেসব বিষয় একটি প্রাদুর্ভাব ঘটাতে সাহায্য করে বহুমাত্রিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে খোঁজা সম্ভব। সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, এমনকি অত্যন্ত সমর্থবান একটিমাত্র পেশার মানুষের থেকে নানা শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষের সমন্বয়ে কোনো কঠিন সমস্যা অধিকতর কার্যকরভাবে সমাধান করা সম্ভব (৯)। প্রাদুর্ভাবের অন্তর্নিহিত কারণ নির্ধারণে এবং প্রতিরোধের জন্য অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপায় খুঁজে বের করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াস অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। অধিকন্তু, একসংগে কাজ করার মধ্য দিয়ে সরকারি এই পেশাজীবীদের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত এবং পেশাভিত্তিক সম্পর্ক তৈরি হবে যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে যোগাযোগ, সমন্বয় এবং সহযোগিতা আরো সহজতর হবে। মায়ানমার এবং

থাইল্যান্ডে একই কর্মসূচির আওতায় মানুষ এবং পশুর ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তাঁরা সম্মিলিতভাবে কোনো প্রদুর্ভাব অনুসন্ধান করতে পারে। মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে যৌথ তত্ত্বাবধানের সাথে এ-ধরনের যৌথ কর্মসূচি তাদের মধ্যে সহযোগিতার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করতে পারে, যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্ভব হতে পারে।

প্রতিবেদক: প্রোগ্রাম অন ইনফেকশস ডিজিজেস অ্যান্ড ভ্যাকসিন সায়েন্সেস, আইসিডিডিআর,বি; চট্টগ্রাম ভ্যাটেরনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভারসিটি; রোগতত্ত্ব রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

References

1. One Health Initiative. (www.onehealthinitiative.com, accessed on 2 March 2011).
2. World Food Program. Agricultural production & national food balance—Bangladesh. (http://foodsecurityatlas.org/bgd/country/availability/agricultural-production, accessed on 25 January 2011)
3. Robinson EJZ, Das SR, Chancellor TBC. Motivations behind farmers' pesticide use in Bangladesh rice farming. *Agric Human Values* 2007;24:323-32.
4. Kashem MDA, Singh BR. Heavy metal contamination of soil and vegetation in the vicinity of industries in Bangladesh. *Water Air Soil Pollut* 1999;115:347-61.
5. Smith AH, Lingas EO, Rahman M. Contamination of drinking-water by arsenic in Bangladesh: a public health emergency. *Bull World Health Organ* 2000;78:1093-103.
6. Luby SP, Gupta SK, Sheikh MA, Johnston RB, Ram PK, Islam MS. Tubewell water quality and predictors of contamination in three flood-prone areas in Bangladesh. *J Appl Microbiol* 2008;105:1002-8.
7. United Nations Children Fund. Avian influenza knowledge, attitude and practice (KAP) survey among the general public and poultry farmers in Bangladesh. Dhaka: United Nations Children Fund, 2007.
8. World Health Organization. Cumulative number of confirmed human cases of avian influenza A/(H5N1) reported to WHO. 2011 (http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/en/, accessed on 25 January 2011).
9. Hong L, Page SE. Groups of diverse problem solvers can outperform groups of high-ability problem solvers. *Proc Natl Acad Sci* USA 2004;101:16385-9.

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাদাগকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশে রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: মার্চ ২০১০-ফেব্রুয়ারি ২০১১

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=৮৬)	*ভি. কলেরি ও১* (সংখ্যা=৪৯৩)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	১.২	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৬৬.৭	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫৩.৫	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	২৯.৪	১.২
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৫০.৬	৯৯.৮
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৬২.৯
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.২
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা, রোটাভাইরাস এবং ইটিইসি-এর তুলনামূলক চিত্র: মার্চ ২০১০-ফেব্রুয়ারি ২০১০

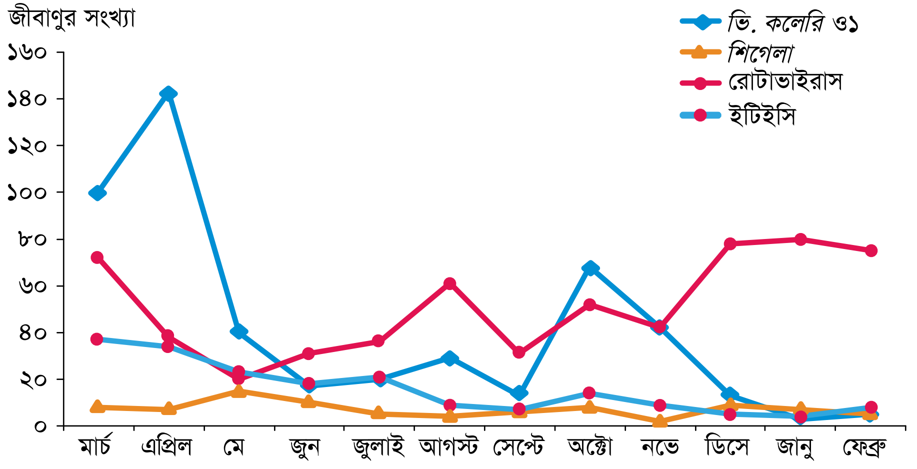

ওষুধের বিরুদ্ধে ১৩৩ টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: ফেব্রুয়ারি ২০১০-জানুয়ারি ২০১১

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট সংখ্যা=১৩৩ (%)
	প্রাথমিক সংখ্যা=১২১ (%)	একোয়ার্ড* সংখ্যা=১২ (%)	
স্ট্রেপটোমাইসিন	২২ (১৮.২)	২ (১৬.৭)	২৪ (১৮.০)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	৭ (৫.৮)	১ (৮.৩)	৮ (৬.০)
ইথামবিউটাল	১ (০.৮)	০ (০.০)	১ (০.৮)
রিফামপিসিন	৩ (২.৫)	১ (৮.৩)	৪ (৩.০)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	২ (১.৭)	০ (০.০)	২ (১.৫)
অন্যান্য ওষুধ	২৫ (২০.৭)	২ (১৬.৭)	২৭ (২০.৩)

( ) শতকরা হার *একমাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০১১

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	৮	৮ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	৮	১ (১২.০)	০ (০.০)	৭ (৮৮.০)
ক্লোরামফেনিকল	৮	৩ (৩৭.০)	০ (০.০)	৫ (৬৩.০)
সেফট্রিআক্সোন	৮	৮ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৮	৮ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	৮	০ (০.০)	০ (০.০)	৮ (১০০.০)
অক্সাসিলিন	৮	৭ (৮৮.০)	০ (০.০)	১ (১২.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি-র কমালপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০১১

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	৮	৫ (৬৩.০)	০ (০.০)	৩ (৩৭.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	৮	৩ (৩৭.০)	০ (০.০)	৫ (৬৩.০)
ক্লোরামফেনিকল	৮	৩ (৩৭.০)	০ (০.০)	৫ (৬৩.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	৮	৮ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৮	২ (২৫.০)	০ (০.০)	৬ (৭৫.০)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৮	১ (১২.০)	০ (০.০)	৭ (৮৮.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি-র কমালপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হাসপাতালে ভর্তি শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী এবং বহির্বিভাগে আগত ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের হার: মে ২০০৭-ফেব্রুয়ারি ২০১১

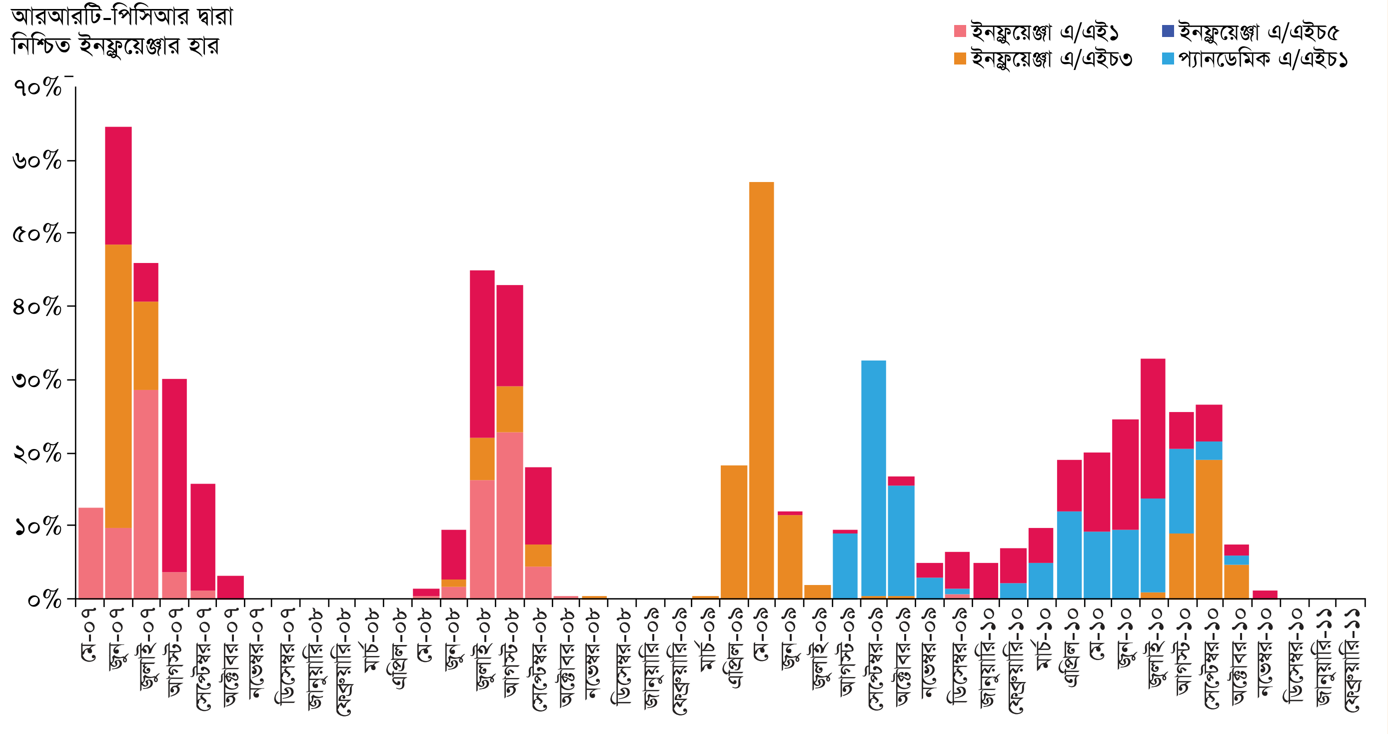

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমিউনিটিভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ময়মনসিংহ), জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (কিশোরগঞ্জ), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বগুড়া), ল্যাম্ব হাসপাতাল (দিনাজপুর), বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যশোর জেনারেল হাসপাতাল, জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিলেট) এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বরিশাল)।

স্কুল খাদ্য কর্মসূচিতে প্রদত্ত উচ্চ শক্তি-সম্পন্ন বিস্কুট

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকূল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি. লুবি
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
ডরথি সাউদার্ন

অতিথি সম্পাদক:
সারা লাট্রিল
কামরুন নাহার

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
১ম নিবন্ধ:
ফারহানা হক
২য় নিবন্ধ:
সানথিয়া আইরিন
৩য় নিবন্ধ:
স্টিফেন পি. লুবি
নিতীস দেবনাথ
মাহমুদুর রহমান

কপি সম্পাদনা, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও অনুবাদ:
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
মাহবুব-উল-আলম

ডিজাইন ও প্রি–প্রেস প্রসেসিং:
মাহবুব-উল-আলম

মুদ্রণে:
অলিম্পিক প্রিন্টার্স

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স নং ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb